উত্তর ভিয়েতনামের এই সংকটের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য ইন্দোচীন রাজ্যগুলি ফ্রান্স থেকে সুবিধা আদায় করতে লাগল। ১৯৫৩ সালে কাম্বোডিয়া সামরিক, বিচার ও অর্থনৈতিক বিভাগে পূর্ণ সর্বভৌমত্ব আদায় করে প্রায় স্বাধীন হয়ে গেল। ঐ একই বছরে লাওসের সঙ্গে একটি চুক্তি করে ফ্রান্স তাকে ইউনিয়নের অভ্যন্তরে পূর্ণ স্বাধীনতা দিল।

দিয়েন বিয়েন ফুতে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর ফ্রান্স সিদ্ধান্ত নিল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করবে। ১৯৫৪ সালে জেনিভায় স্বাক্ষরিত একগুচ্ছ চুক্তির দ্বারা শত্রুতার অবসান ঘটল। ভিয়েতনামকে দুভাগে ভাগ করা হল, ঐক্যের প্রশ্নটি মুলতুবী রইল ১৯৫৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে উত্তরের Communist Democratic Republic of Vietnam এবং দক্ষিণের Nationalist Republic of Vietnam, কম্বোডিয়া এবং লাওস তাদের নিজেদের বৃদ্ধি ও বিকাশের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীনতা পেল।

কিন্তু এত করেও দুই ভিয়েতনামের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা গেল না। জেনিভা আলোচনা থেকে হো চি মিন এই ধারণা অর্জন করেছিলেন যে কোনো না কোনো দিন তিনি সমস্ত ভিয়েতনাম নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাই ১৯৫৬ সালে তিনি স্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের আয়োজন করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের শাসক নো দিন দিয়েম (Ngo Dinh Diem) ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি এবং হো চি মিন উভয়েই দাবি করতে লাগলেন যে তাঁরা হলেন ভিয়েতনামের বৈধ শাসক।

উত্তর ভিয়েতনামের অন্তর্গত ছিল হ্যানয় ও হাইমাং—দুটি স্থানই ছিল কম্যুনিস্ট প্রভাবিত। অন্যদিকে কোচিন চীন, সায়গন এবং অন্নাম ছিল পশ্চিমী দেশগুলির অধীনস্থ—এই অঞ্চলগুলি দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের শত্রু হয়ে রইল। এই বিভাজন ছিল কৃত্রিম। উত্তর ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট চীনের সমর্থনপুষ্ট ছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিশেষ করে আমেরিকার দ্বারা সমর্থিত। জার্মানি এবং কোরিয়ার মতো ইন্দোচীনের বিভাজন আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি পরিচিত ধরণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছিল পশ্চিমী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

৯.২.২০ কাম্বোডিয়া

(কাম্পুচিয়া) ইন্দোচীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল ভিয়েতনাম বিভাজনের সময়। এর জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। কিন্তু স্বাধীনতা ও ভৌমিক সংহতি রক্ষা করাই ছিল কাম্বোডিয়ার সমস্যা। এছাড়াও থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সঙ্গে চলছিল সীমান্ত সংঘর্ষ। খেমর্ মন্দির নিয়ে থাইল্যান্ডের সঙ্গে কাম্বোডিয়ার বিবাদ আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তবে এই বিবাদে কাম্বোডিয়া জয়ী হয়েছিল। কাম্বোডিয়ার শাসক নরোদম সিহানক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর এই নীতি এত সাফল্য অর্জন করেছিল যে সমস্ত সম্ভাব্য উৎস থেকে কাম্বোডিয়ার ওপর আর্থিক সাহায্য বর্ষিত হয়েছিল। ফলে কাম্বোডিয়া একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা যখন ফ্রান্সের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইন্দোচীনে কুম্যুনিজমের প্রসার রুখতে চেয়েছিল তখন সিহানুক তা বাধা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি কম্যুনিস্ট চীনের দিকে ঝুঁকলেন এবং তাঁর কম্যুনিস্ট প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে লাগলেন।

কিন্তু যখন চীন প্রতিবেশী দেশগুলিতে কম্যুনিজম প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করল তখন আবার সিহানুক তাঁর নীতি পরিবর্তন করেছিলেন। যে তিনি, আমেরিকা যখন কম্যুনিস্টদের দমন করেছিল, তখন তার প্রতিবাদ করেছিলেন, এখন নিজেই আরো নিষ্ঠুর ও কঠোরভাবে কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালে আবার তাঁর হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটল, তখন কম্যুনিস্টরাই একটি ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠাল। এরপর ভিয়েতমিন কম্যুনিস্টরা কাম্বোডিয়া ছেয়ে ফেললে ওয়াশিংটন দোটানায় পড়ল, কারণ ধারণের নীতি অনুসারে কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপ করার আরেকটি অজুহাত উপস্থিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে নিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের, আক্রমণের ঘাঁটি হল দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় সারণী অনুযায়ী আমেরিকা কাম্বোডিয়া ত্যাগ করল। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কম্যুনিস্টদের দমন করতে লাগল।

৯.২.২১ লাওস

১৯৫৪ সালে জেনিভা প্রটোকল দ্বারা যে চারটি দেশস্বাধীন হয়েছিল লাওস ছিল তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। লাওসের অবস্থা ছিল পশ্চাদপদ। এখানে সীমিত অভিজাত শ্রেণি, যা গঠিত ছিল রাজা ও তার পরিবারবর্গ, বড়ো জমিদার এবং বৌদ্ধ পুরোহিতদের নিয়ে। লাওস সরকার স্থানীয় কম্যুনিস্টদের দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ছোটো এই দেশের গোলোযোগ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল। আমেরিকা যেমন লাওসিয়ান কম্যুনিস্ট বিরোধীদের সমর্থন করতে লাগল, রুশ, চীনা ও ভিয়েতমিনরা তেমন কম্যুনিস্টদের সমর্থন করল। তবে কোনো পক্ষেরই প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না খৌমার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল না, শান্তির আশায় তিনি গৃহীত হয়েছিলেন এই মাত্র।

৯.২.২২ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসান

মধ্যপ্রাচ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য ঃ উত্তরে পারস্য ও দক্ষিণে আরব উপকূল এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকেপশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত তা মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত এবং এই ভূখণ্ডের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মধ্যপ্রাচ্য এই অভিধাটি নির্দেশ করে যে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে যাবার তোরণদ্বার হল এই অঞ্চলটি। আফ্রিকা উন্মোচিত হবার পরে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়, কারণ পশ্চিম ইউরোপ এবং রাশিয়া থেকে আফ্রিকা যাবার পথে এটি অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্য চিন্তা, ধর্ম এবং ঐহিক কল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৯.২.২৩ মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের উৎস ও স্বরূপ

আশ্চর্য এই যে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের এ হেন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সত্ত্বেও তা ঐক্য ও মিলনের কারণ না হয়ে বিরোধ ও আশঙ্কার উৎস হয়েছে। খ্রিস্টান, ইহুদি ও ইসলাম—এই তিনটি ধর্মের সূতিকাগৃহ হল মধ্যপ্রাচ্য, ফলে মধ্যযুগে এখানে ধর্মযুদ্ধের আধিক্য ঘটেছিল। যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করা হচ্ছে তাতে যে সমস্যা অত্যন্ত দুর্দমনীয় আকারে দেখা দিয়েছে তা ঐ ধর্মীয় সংকটের ফসল। সংক্ষেপে এর সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ইহুদি আন্দোলন বলে। এই আন্দোলন বলতে বোঝায় ইহুদিদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব

বাসভূমির অনুসন্ধান (Judaism এবং Zionism)। একই রকম ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত অধিবাসীরা ইসলামের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আধুনিককালে নিখিল আরব ঐক্য (Pan Aralism) এই শ্লোগান তাদের ঐক্যকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে পশ্চিমী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান সভ্যতার জীবনামৃত তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে এখানে অন্ধ পতঙ্গের মতো আকর্ষণ করেছে, দুঃখজনক হল এই যে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার উপযোগী প্রযুক্তির জন্য আরব দেশগুলিকে পাশ্চাত্য দেশগুলির ওপর নির্ভর করতে হত।

৯.২.২৪ মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভূমিকা

১৯৩৯ সালের আগে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সক্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি, পুঁজি বিনিয়োগ করার সাথে সাথে এই দুটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এখানে খুবই প্রকট ছিল। ফ্রান্সের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বেশি দৃশ্যমান ছিল ইজিপ্ট, সিরিয়া এবং লেবাননে। আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশরা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেখানে তারা সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিত, সুশাসনের ধারণা ও প্রতিষ্ঠার সূচনা করেছিল। তবে, রাজনৈতিকভাবে ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রভাব হয়েছিল বিপজ্জনক, যা ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদকে লালন করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে ফরাসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখানকার কৃত্রিম বিভাজনকে দৃঢ় করে তুলেছিল।

তা সত্ত্বেও ১৯২০-র দশকে ব্রিটেন টান্সজর্ডন ও ইরাকের শাসকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ইজিপ্টে ব্রিটিশরা ক্রমাগত বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু দামাস্কাসে ফরাসিরা বিদ্রোহে অতিষ্ঠ হয়ে বোমাবর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ ম্যানডেট ইরাক কার্যত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, ব্রিটেনের সাথে তার রক্ষণাত্মক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, ইরাকে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হল। ১৯২২ সালে প্রাপ্ত ইজিপ্টের স্বাধীনতা অতটা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। ব্রিটেন সেখানে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি দেখাশোনা করা ছাড়াও আভ্যন্তরীণ কোনো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত। ইটালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করার পর ব্রিটেন ও ইজিপ্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৯৩৬ সালে। ১৯২৫-২৭ সালের মধ্যে সিরিয়াতে যে বিদ্রোহ দেখা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স তার ম্যানডেটের মেয়াদ শেষ করতে চাইল না। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখল, কারণ দুটি রাজ্যই ফ্রান্সের ম্যানডেট ছিল।

৯.২.২৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকট : প্যালেস্টাইন সমস্যা

আরব রাজ্যগুলির দক্ষিণে ইটালির উপস্থিতি ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সম্ভবপর করেছিল, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই বিদেশি প্রভাবের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় শুরু হল। কিন্তু সংকট আসন্ন হয়ে উঠল প্যালেস্টাইন সমস্যাকে ঘিরে। ১৯১৭ সালে যখন ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ম্যানডেট লাভ করেছিল তখন ব্যালফুর (Balfour) ঘোষণার দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন দিয়েছিল যে প্যালেস্টাইন হবে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিদের বাসভূমি সংক্রান্ত আন্দোলন (Zionist Movement) গড়ে উঠল এবং প্যালেস্টাইনে দলে দলে ইহুদি অধিবাসীদের আগমন ঘটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে ভাবতে হল যে প্যালেস্টাইনে সে ইহুদিদের কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা দেবে। এই ভাবনা আবার আরব

অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তারা ইহুদি অধিবাসীদের আগমন কিংবা প্যালেস্টাইন বিভাজন যে কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এই দোটানার মধ্যে পড়ে ব্রিটিশ সরকার স্থির করল ইহুদি অধিবাসীদের সংখ্যা সীমিত করতে হবে। ১৯৩৯ সালের গোড়ায় এই সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হল ব্রিটিশ সরকার তখন প্রতিশ্রুতি দিল যে আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাজ্য গঠন করা হবে সেখানে আরব ও ইহুদিরা এমনভাবে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করবে যাতে উভয়ের স্বার্থের নিরাপত্তা বজায় থাকে।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যে তার গভীর প্রভাব পড়েছিল। এখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তৈল সরবরাহ বজায় রাখা ব্রিটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ছিল। ফ্রান্সের পতন হলে জার্মানির পক্ষে বলকান ও ভূমধ্যসাগরের দিকে নজর দেওয়াতে আর কোনো বাধা রইল না। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের দিক দিয়ে দেখলে অবশ্য তত বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। কারণ, সেখানে জার্মানি ও ইটালির সাফল্য সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা হয়েছিল। পারস্যের শাহ জার্মানির সাফল্যের উদাহরণে উৎসাহিত হয়েছিলেন, জেরুজালেমের মুফতি হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ইজিপ্টের শাসক ফারুক জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইহুদিদের পক্ষে হিটলারের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই ইটালি বা জার্মানির পক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন জনসাধারণের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত খুব বেশি ছিল না। ট্রান্সজর্ডন ও ইরাকের হাসিম বংশীয় শাসকরা বা ইবন সাউদের পক্ষে অক্ষ শক্তির সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থে জড়িত ছিল। তা শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত আকার ধারণ করল।

৯.২.২৬ মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব

দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে ইরাকের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক মোটের ওপর বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। ইরাকি রাজনীতিবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নুরি-আল-সাঈদ ব্রিটিশ সহায়তার দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরাকি সরকার ইঙ্গ-ইরাকি চুক্তি অনুসারে জার্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা স্বাভাবিকভাবে ব্রিটেনের বিপর্যয়ের সুযোগ নিতে চেয়েছিল এবং জার্মান সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিল। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিলেন রশিদ আলি, যিনি ইরাকি খানদানি পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু বহির্জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না।

১৯৪০ সালে রশিদ আলি ইরাকের প্রিমিয়ার হলেন, নুরি-আল-সঈদ তাঁকে সরকারি পদাধিকারি করে বিপন্মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। যখন ইটালি যুদ্ধে যোগদান করল তখনও রশিদ আলি ইটালির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না, চার্চিল অভিযোগ করলেন যে বাগদাদ হল অক্ষশক্তির প্রধান প্রচার কেন্দ্র এবং ব্রিটিশ বিরোধী অনুভূতির উৎস। ফ্রান্সের পতন হলে ব্রিটেন ভীত হয়ে রশিদ আলিকে ক্ষমতাচ্যুত করল। কিন্তু সেনাবাহিনীর জাতীয়তাবাদী একটি অংশ, যারা গোল্ডেন স্কোয়ার (Golden Square) নামে পরিচিত ছিল, রশিদ আলিকে আবার ফিরিয়ে আনল। রশিদ আলি ইঙ্গ-ইরাকি চুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেও ইটালির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না।

এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠল। জার্মানি যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রিস আক্রমণ করেছিল। এমতাবস্থায় অক্ষশক্তির সঙ্গে ইরাকের চুক্তির সম্ভাবনা ব্রিটেনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটেন ইরাকি সেনাদের হাত থেকে হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটি অধিকার করে নেওয়াতে ইরাকি প্রতিরোধ ভেঙে

পড়ল। রশিদ আলি ও তাঁর সমর্থকরা প্রথমে পারস্য পরে তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। এরপর থেকে ব্রিটেন ও আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সম্পর্কের সবিশেষ উন্নতি ঘটল।

রশিদ আলি ঘটনার প্রভাব পড়ল পাশ্ববর্তী ফরাসি ম্যানডেট অঞ্চলগুলির ওপর। ১৯৪০ সালে যখন ফ্রান্সের পতন ঘটল তখন সিরিয়া দ্য গলের সাথে যোগ দিতে চাইল না। এদিকে জার্মানি ইরাকে যে বিমান সহায়তা পাঠাতে পারত তাঁর ঘাঁটি ছিল সিরিয়া। ফ্রান্স নিজের দেশে নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য সিরিয়াতে জার্মান ঘাঁটি করার অনুমতি দিল, শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করার কথায় রাজি হল। কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনী ও ফরাসি মুক্তাঞ্চল বাহিনী সিরিয়া আক্রমণ করল। ফ্রান্সও কোন অজ্ঞাত কারণে জার্মান সহযোগিতা চাইল না। ১৯৪১ সালের ১৪ই জুলাই সিরিয়া ব্রিটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্কে লক্ষণীয় অবনতি ঘটল। এই বিরোধের কেন্দ্র ছিল সিরিয়া ও লেবাননে আরবদের সঙ্গে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্ক।

সিরিয়াতে জার্মানির সমর্থক ভিশি (Vichy) বাহিনীর বিরুদ্ধে কমনওয়েল্‌থ্‌ ও ফরাসি মুক্তাঞ্চল বাহিনী একত্রে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু চার্চিল ফরাসি বাহিনীকে সক্রিয় হতে দিতে চাইতেন না বলে দ্য গল আশঙ্কা করলেন যে বেইরুট বা দামাস্কাসে ফরাসি শক্তি দৃঢ়ভাবেপ্রাথিত না করলে জার্মানি বা ব্রিটেন তা দখল করে নেবে অথচ তাঁর নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল গোলমেলে। কারণ তিনি আরব জাতীয়তাবাদ দমন করার মতো শক্তিশালী ছিলেন না, আবার ব্রিটেনের বা জার্মানির কাছে ফরাসি সার্বভৌমত্ব সমর্পণ করার মতো দুর্বলও ছিলেন না। আবার তিনি সিরিয়া এবং লেবাননের স্বাধীনতা দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্য গল আরবদের আশ্বাস দিলেন এই বলে যে চুক্তির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দেওয়া হবে আবার জার্মান ভীতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি ফরাসি সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশ সেনাপতিত্বে কাজ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সর্বদাই এই সন্দেহ জাগরুক ছিল যে ব্রিটেন ফ্রান্সকে বিতাড়িত করে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাঁর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা প্রমাণ হল যখন ব্রিটেন নিজের শর্ত আরোপ করে ফ্রান্সের দেওয়া স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাইল। ব্রিটেন আরব জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের দাবিকে সমর্থন করে ঐ অঞ্চলে তার প্রভাব বজায় রাখল। সিরিয়া ও লেবাননে তারা ফরাসিদের প্রতিকূল অনুভূতি সৃষ্টি করতে লাগল। ১৯৪১ সালের মে মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেনের বক্তব্যে এই নীতি প্রতিফলিত হল।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের সংকট ঘনীভূত হতে থাকল কারণ ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে সিরিয়া ও লেবানন উভয় স্থানেই ফরাসিরা পরাস্ত হল। আলজিয়ার্সে একটি ফরাসি জাতীয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হল ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা গণতান্ত্রিক ভিত্তি কোনোটিই এই সংগঠনের ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের সংকট ছিল এইখানে যে সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেন নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চাইত, আর এই শান্তির জন্য সে সিরিয়া ও লেবাননের বিষয়ে ফ্রান্সকে সুবিধা দেবার জন্য চাপ দিতে থাকল। শেষপর্যন্ত ১৯৪৪ সালের পয়লা জানুয়ারি একটি সমঝোতায় আসা গেল। এই সমঝোতা অনুযায়ী সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীনতা পেল কিন্তু সামাজিক সহায়তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ রইল, সর্বোপরি স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর ওপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রইল।

স্বভাবই সিরিয়া ও লেবানন নিজেদের স্বাধীনতার ওপর এই শর্ত আরোপ পছন্দ করল না। উপরন্তু দুটি দেশই জানত যে ব্রিটিশ সৈন্যের অনুপস্থিতিতে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

শেষে সংকট আরো জটিল হল। ফ্রান্স নতুন করে সৈন্যবাহিনী পাঠাল। সিরিয়া লেবাননের প্রধান শহরগুলিতে দাঙ্গা দেখা দিল। ব্রিটেন যখন দ্য গলকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বললেন, তখন তিনি আর এই অনুরোধ মেনে নেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। উপায়ান্তর না দেখে ব্রিটেন ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। মার্চ মাসে সিদ্ধান্ত হল যে সিরিয়া ও লেবানন থেকে ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্য অপসারিত হবে। এভাবে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীনতা লাভ করল। এভাবে ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননের ঘটনা ইঙ্গ-ফরাসি সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছিল।

৯.২.২৭ পারস্য

এখানে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যের প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ জার্মান সৈন্য ককেশাস পর্বতপার হয়ে অগ্রসর হয়েছিল।পারস্যের শাসক রিজা শাহ জার্মানির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এছাড়াও জার্মানি পারস্যে বাণিজ্য করত, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটাত। এভাবে পারস্যে জার্মানি বেশ ভালো প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর পারস্যকে ঘাঁটি করে জার্মানি যখন ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হতে চাইল তখন দেখা গেল যে জারশাসিত রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি আঁতাতের সূত্র ধরে রাশিয়া ও ব্রিটেন পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। রিজা শাহ সিংহাসন ত্যাগ করলেন। এরপরে পারস্য রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাথে একটি বেসামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ঐ চুক্তির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য থেকে ব্রিটিশ ও রাশিয়া সৈন্য অপসারণ করবে বলে স্থির হল।

৯.২.২৮ মিশর বা ইজিপ্ট

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে মিশর প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ মিশর আক্রান্ত হয়েছিল। যদিও লোকালয়গুলি এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে মিশর ছিল ইটালি ও জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রতিরোধের প্রধান ঘাঁটি, যা ব্রিটেন যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে চাইত। এর জন্য মিশরের সমস্ত প্রধান শহরগুলো চলে গিয়েছিল ব্রিটিশ দখলে। কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্র (Middle East Supply Centre) যেখানে অনেক মিশরি বেসামরিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। এর ফলে মিশরের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছিল মুদ্রাস্ফীতি ও ঘাটতি। যেহেতু ব্রিটেন সরাসরি সরকারের দায়িত্বে ছিল না সেহেতু সে অর্থনীতির এই অধঃপতন রোধ করার কোনো চেষ্টা করল না। মিশরে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মিশর যাতে তার সাথে যুদ্ধে সামিল হয় তা সুনিশ্চিত করা। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতন হল। ইউরোপে ইটালি ও জার্মানির জয়জয়কার। তখন মিশর ভাবতে শুরু করল যে ব্রিটেনের প্রতিরোধের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে বসেছে। এমতাবস্থায় সে অক্ষশক্তির সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখাই সমীচীন মনে করল। বাধ্য হয়ে ব্রিটেন মিশরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করল, আলি মাহির হাসান সাবরির অনুকূলে পদত্যাগ করলেন।

হাসান সাবরি ১৯৩৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধসমর্থন করতেলাগলেন। কিন্তু মিশরের একটি প্রভাববিহীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এই মত প্রচার করতে লাগল যে যুদ্ধের শেষে আলাপ আলোচনার সুবিধা পাবার জন্য মিশরের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত।

এদিকে ব্রিটিশ বিরোধী গোষ্ঠী আলি মাহিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মিশরের ক্ষমতাহীন রাজাকে প্রভাবিত করে আলি মাহির আবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন। কিন্তু ব্রিটেন সেনা পাঠিয়ে রাজাকে বাধ্য করল ওয়াফদ্ দলের নেতা নাহাস পাশাকে দিয়ে সরকার গড়তে। এটাই প্রমাণ করল যে যেকোনো মূল্যে ব্রিটেন মিশরে তার প্রভাব বজায় রাখবে। যদিও এরপর ওয়াফদ্ দল ব্রিটেনের প্রতি তার আনুগত্য বজায় রেখে চলেছিল তবুও ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি তার পক্ষে কণ্টকস্বরূপ ছিল। মিশর ক্ষুব্ধ হয়ে দেখল যে ব্রিটেন সুদানকে স্বাধীনতা দিচ্ছে, অথচ এখানে মিশর ব্রিটেনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগ শুরু করার স্বপ্ন দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত মিশর যুদ্ধে যোগদান করা সাব্যস্ত করল কারণ কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদান করা মিশরের ন্যায্য দাবি আদায়ের একমাত্র উপায় বলে মিশর মনে করত।

৯.২.২৯ প্যালেস্টাইন সমস্যা : মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী সংকট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত আগে একটি শ্বেতপত্রের দ্বারা ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ সীমিত করেছিল। কিন্তু এর ফলে প্যালেস্টাইনে একটি নিজস্ব বাসভূমি অর্জন করার স্বপ্ন বিফল হতে বসেছিল। ফলে ইহুদিরা বেআইনি অনুপ্রবেশ করতে লাগল এবং এর জন্য ম্যানডেট কর্তৃপক্ষের সাথে তারা যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত ছিল। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের সমর্থনে জায়নিস্টরা প্যালেস্টাইনে নিজেদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৩৬ সালে মনে হল যে ব্রিটেন হয়ত বিভাজনের প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে ব্রিটেন ও ইহুদিরা উভয়েই যখন নাৎসী জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হল তখন ইহুদিরা উপলব্ধি করল যে এখন জার্মানিকে পরাস্ত করাই একমাত্র লক্ষ্য। যুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হলে পর ইহুদিরা গোটা বিশ্বের কাছে সফলভাবে তাদের দাবি পেশ করতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই ম্যানডেটের অবসান ঘটবে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। এমনিতেই ইহুদিরা ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, কাজেই প্যালেস্টাইনকে নিজভূমিতে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা দোটানায় পড়েছিল। ইহুদি নেতা বেন গুড়িয়ন (Ben Gurion) মন্তব্য করেছিলেন যে এমনভাবে ইহুদিদের সংগ্রাম করতে হবে, যেন হিটলার বা ব্রিটিশ ম্যানডেট কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল। প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংগঠিত গোষ্ঠী ছিল হাগানা, তারা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে ব্রিটেন দোটানায় ছিল এই চিন্তায় ইহুদি না আরব কার সঙ্গে মৈত্রী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বেশি লাভজনক হবে। ১৯৪৩ সালে যখন এল আলামেন ও স্টালিনগ্রাদের বিজয় যুদ্ধের গতিপরিবর্তন করেছিল, অক্ষশক্তির বিজয় রথ থামিয়ে দিয়েছিল তখন ইহুদিরা তাদের দোটানার অবসান করেছিল। অন্যদিকে জার্মানিতে হিটলার ইহুদিদের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন যে মনে হল সমগ্র ইহুদি জাতটাকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ফলে হাগানা আরো দৃঢ়ভাবে ইহুদিদের সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে লাগলো, এ ব্যাপারে ব্রিটেনকে তারা কোন গুরুত্ব দিতে রাজি হল না।

কিন্তু চার্চিলের সহানুভূতির বলে ব্রিটেন ইহুদিদের সাথে বিরোধে না জড়িয়ে একটি ইহুদি সেনাদল গঠন করল, যারা ইটালিতে নিজস্ব পতাকাতলে যুদ্ধ করল, যেপতাকা পরে ইজরায়েলের পতাকায় পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইহুদি সংগঠন আরো শক্তিশালী হল, কারণ, ১৯৪০ সাল থেকে আমেরিকাতে বিভিন্ন ইহুদি সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, World Zionist সংগঠনের প্রতিনিধিস্বরূপ আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হল American

Zionist Emergency Council যা যুদ্ধ শেষে ইহুদিদের সমস্যার সুরাহার জন্য আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে চাপ সৃষ্টি করত। এর ফলে ইহুদিদের সুবিধা হল কারণ ব্রিটেনের সঙ্গে সরাসরি বিরোধ হলে আমেরিকার সমর্থন পাওয়া নিশ্চিত হল, অন্যদিকে আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধাবসানের আলোচনায় ইহুদিদের পক্ষে আমেরিকার বক্তব্য জোরালো হবে। ১৯৪২ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কের বিল্ট্মোর হোটেলে American Zionist Emergency Council বেন গুড়িয়নের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিল যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অনুপ্রবেশ অবাধ করতে হবে, প্যালেস্টাইনের উন্নতির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস করতে হবে এবং প্যালেস্টাইন হবে একটি ইহুদি কমনওয়েল্থ ও নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত একটি দেশ। ক্রমশ AZEC একটি জঙ্গী সংগঠনে রূপান্তরিত হল। আমেরিকাকে এই সংগঠনটি যুদ্ধকালীন যে পরামর্শ দিয়েছিল তা ছিল সর্বজনগ্রাহ্য শ্রমিক ইউনিয়ন ও কংগ্রেসীয় কমিটি উভয়ের কাছেই তা সমর্থিত হয়েছিল।

কাজেই যুদ্ধশেষে AZEC-র অবস্থান হয়েছিল অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক। তারা একটি সরকার ও সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল, এভাবে সামরিক শক্তি অর্জন করে ইহুদিরা এক সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। হিটলারের অত্যাচার সশস্ত্র দুনিয়ার সহানুভূতি তাদের ওপর বর্ষণ করেছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেনে তাদের কর্মকেন্দ্র দুটি বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ করত। তারা আরবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। কিন্তু প্যালেস্টাইনের সন্ত্রাসবাদী ইহুদি সংগঠনগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঠিক সুস্পষ্ট ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ওপর থেকে ম্যানডেট প্রত্যাহার করে নিল। এরপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়—একটি ইহুদি অধ্যুষিত রাষ্ট্র, অন্যটি আরব জাতি অধ্যুষিত রাজ্য। কিন্তু আরবজাতি এই সমাধান সূত্র মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইনে তার ম্যানডেট ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিল। এর সূত্র ধরে ইহুদিরা তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব নিয়ে গঠিত আরবলীগ নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্রকে যৌথভাবে আক্রমণ করল। কিন্তু আরব সঙ্ঘ ক্ষুদ্র ইজরায়েল বাহিনীর কাছে পরাস্ত হল। শক্তির লড়াইয়ে জয়লাভ করে ইজরায়েল দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হল এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইজরায়েল একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল।

৯.২.৩০ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতার অবসানের ফলাফল

মনে হতে পারে যে একমাত্র প্যালেস্টাইন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র বুঝি ব্রিটিশ ক্ষমতা ও আধিপত্য অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। আরব রাষ্ট্রগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল তাতে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্য এখনও ব্রিটিশ করতলগত, এখানে যোগাযোগ ও সৈন্যচালনার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তার রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্র ব্রিটিশ পুঁজি সরবরাহ ও বিনিয়োগের মাধ্যম ছিল, অথচ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্স ছিল ব্রিটেনের পুরোনো শত্রু। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও পরে ফ্রান্সের ক্ষমতা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল আর তার সমস্ত সামরিক ঘাঁটিগুলি বেহাত হয়ে গিয়েছিল। জারতন্ত্রী রাশিয়ার ধারা অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর পারস্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া ব্যর্থ হয়েছিল। তুরস্ক ও উপসাগর অঞ্চলে রাশিয়া যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তাও নিষ্ফল হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যত্র

যেমন মধ্যপ্রাচ্যেও তেমন আমেরিকা তার অর্থনৈতিক ও সামরিকসক্রিয়তা বিস্তার করেছিল, আরবে সে বিমান ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তুরস্ক, ইরাক, আরব এবং পারস্যে লেন্ড-লীজ চুক্তি সম্পাদন করেছিল আমেরিকা। যদিও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছিলেন এবং আরব নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবুও এমন মনে করার কারণ ছিল না যে আমেরিকা অদূর ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে না। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জায়নিজ্মের প্রতি তার সমর্থন ব্রিটিশ অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলেছিল—এছাড়া তখনকার মতো আমেরিকার আর কোনো সক্রিয়তা নজরে পড়ছিল না

তবুও, একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিলীয়মান হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব জুড়েই ব্রিটিশ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিল। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ব্রিটেনের অপরিশোধিত ঋণ ঐ অঞ্চলে তার অবস্থানের গুণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল। গ্রিস থেকে ব্রিটেন নিজেকে সরিয়ে নেবার পর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আমেরিকা প্রবেশ করেছিল। সুতরাং, ধীরে হলেও আমেরিকা যে মধ্যপ্রাচ্যে পা দিতে চলেছে তা আর অবিদিত রইল না। ঠান্ডা লড়াই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলে পর বোঝা গেল যে মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে চলেছে, ব্রিটেনের মতো একটি অবক্ষয়মান শক্তির কর্মক্ষেত্র হয়ে আর মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান করা সম্ভব নয়।

৯.২.৩১ ঔপনিবেশিকতার অবসান : আফ্রিকার জাগরণ

পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এশিয়ার বিদ্রোহের মতোই আফ্রিকার জাগরণ আন্তর্জাতিক ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনাগুলির অন্যতম। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আফ্রিকার সমস্যার প্রকৃতি আমূল বদলে যায়। আফ্রিকার প্রতি ঔপনিবেশিক নীতির স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নীতির বিষয়বস্তু হলে দাঁড়ায় আফ্রিকা। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের প্রথম সংযোগ ঘটেছিল দাস ব্যবসার মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বৎসরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকার আংশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পৌঁছে গিয়েছিল আফ্রিকার সম্পূর্ণ বিভাজনে। বিংশ শতকেও দাসব্যবসার কালো ছায়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্ককে আবৃত করেছিল। কাজেই আফ্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত যখন ইউরোপের কূটনৈতিক আলোচনা কক্ষে নির্ধারিত হত তখন দাস ব্যবসার স্মৃতি আফ্রিকাকে গভীর ঘৃণায় মথিত করত। এর ফলে সেখানে জন্ম নিয়েছিল তীব্র প্রতিক্রিয়া, কখনো তা আক্রমণাত্মক, কখনো বিদ্বেষপূর্ণ রূপ ধারণ করে ইউরোপের আধিপত্য ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আফ্রিকার প্রধান অভিযোগের মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে দেশবাসীর ওপর কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আফ্রিকার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিল তা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে কঠোর বা নিষ্ঠুর ছিল না কিন্তু তা ছিল পিতৃসুলভ। এই আচরণের ঘেরাটোপ থেকে আফ্রিকা তার উপজাতীয় আদিম জীবনযাত্রা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, ফলে আফ্রিকা আধুনিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য ফল ছিল, আফ্রিকায় তা জীবনযাত্রার ধারাকে সহজ ও গতিশীল করে দিয়েছিল। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে দিয়েছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে আত্মনির্ধারণে নীতি গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই নীতির প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ও পরে তা আটলান্টিক

চার্টারে স্থান পেয়েছিল। শক্তিই হল অধিকার সাম্রাজ্যবাদের এই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব দুই বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। তথাপি ১৯৪৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, লাইবেরিয়া এবং ইথিওপিয়া ব্যতীত সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ তখনও সেই একই ইউরোপীয় দেশগুলির অধীনে ছিল, যারা বিগত ৭০ বছর ধরে আফ্রিকা শাসন করছিল। কিন্তু আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হচ্ছিল, তা পনেরো বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত মহাদেশেরঔপনিবেশিক শাসনপাশ ছিন্ন করেছিল।

৯.২.৩২ জাতীয়তাবাদের বিকাশ : আফ্রিকা ও এশিয়া ; একটি তুলনামূলক আলোচনা

আফ্রিকা ও এশিয়ার জাতীয়তাবাদী বিকাশের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল এই যে উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল ক্রমবিকাশের ধারায়। এই জাতীয়তাবাদের উত্থানের পেছনে ছিল পাশ্চাত্য কর্তৃত্ব ও প্রভাব। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী বিকাশের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। এশিয়ার জাগরণ সর্বদা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল। ইন্দোচীন ছাড়া এশীয় দেশগুলির মুক্তি অবধারিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসাবে, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ তা প্রমাণ করেছিল। আবার, কোনো কোনো এশীয় দেশ, যেমন জাপান ইউরোপীয় অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু কখনো জাপান ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়নি। চীন ছিল আধা স্বাধীন, আধা উপনিবেশ, ইউরোপীয়দের সংসর্গ তাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে আফ্রিকার মূল সমস্যাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং পর্তুগাল—এই চারটি ঔপনিবেশিক শক্তির অস্তিত্ব আফ্রিকায় ছিল। উত্তরে মিশর ও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Union of South Africa) ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত। তবে, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েল্‌থ্‌ ভুক্ত হয়েও স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে আর তা হল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিকতা বিরোধী। এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো আফ্রিকার জনগণের ক্ষোভের উৎস ছিল চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব চরমপন্থী জাতীয়তাবাদকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছিল। একদিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে আফ্রিকার স্বাধীনতা স্পৃহা এবং এই মহাদেশে কম্যুনিজ্‌মের প্রসার জাতীয়তাবাদের শিকড়কে শক্ত করে তুলেছিল।

৯.২.৩৩ আফ্রিকার জাগরণের প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকার অধিবাসীরা যোগদান করেছিল। এই অভিজ্ঞতা এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অনৈক্য তাদের স্বাধীনতা লাভ করতে আগ্রহী করে তুলেছিল। তারা দেখেছিল শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরা তাদের শোষণ করে সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করেছিল। এতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত আফ্রিকানরা তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আফ্রিকার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনতা বিদেশি শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

আফ্রিকানরা যখন এইভাবে পাশ্চাত্য শোষণের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়েছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে তখন তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল—প্রথমত, ধারাবাহিকভাবে মুক্তিকামী দেশগুলিকে স্বাধীনতা

দান করা। গোল্ড কোস্ট বা আধুনিক ঘানা, সুদান এবং নাইজেরিয়াতে ব্রিটেন এই নীতি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, আফ্রিকারস্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করা, শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করে ব্রিটেন স্বাধীনতা স্পৃহা অবদমিত রেখেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য এই নীতি গ্রহণ করেছিল। তৃতীয় ধারাটি ছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে মিলনসূত্র গ্রথিত করে শাসকদের সঙ্গে নাগরিক সমতা আনয়ন করা। ফ্রান্স ছিল এই নীতির প্রবক্তা।

৯.২.৩৪ আফ্রিকাতে ইসলামি জাতীয়তাবাদ

আফ্রিকার সমস্যা জটিলতর হয়েছিল যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘু ও নিগ্রো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপস্থিতি। মিশর ছাড়া আফ্রিকার মুসলমান জনসাধারণ বেশির ভাগই ছিল ফ্রান্সের অধীনস্থ অঞ্চলে। মুসলমানদের সমস্যা আফ্রিকায় ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির প্রধান সমস্যা ছিল। কিন্তু নিগ্রো সমস্যা ছিল অধিকতর ব্যাপক, যা আফ্রিকায় জড়িত সমস্ত পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিব্রত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স আফ্রিকাতে যে ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপন করেছিল তা ছিল ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির উৎস। ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। টিউনিসিয়া ও মরক্কো ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য। কিন্তু আলজিরিয়াকে ফ্রান্স সাংবিধানিকভাবে নিজস্ব রাজ্য বলে গণ্য করত। সেখানকার ৯ মিলিয়ন অধিবাসীদের মধ্যে 1 মিলিয়ন ছিল ফরাসি, কিন্তু মরক্কোর আট মিলিয়ন জনসংখ্যার অর্দ্ধ মিলিয়ন ছিল ফরাসি। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে টিউনিসিয়া ও মরক্কোতে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল। মরক্কোর রাজনৈতিক সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করেছিল কারণ দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মরক্কোতে শিল্পায়ন ও শহরের উদ্ভব সেখানকার রাজনৈতিক সমস্যাকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছিল। মরক্কোর সুলতান ছিলেন ফরাসি সরকারের হাতের পুতুল, কিন্তু তিনি এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। মরক্কোর আরবরা ছিল ফ্রান্সের সমর্থক, তারা ফরাসি সরকারকে রসদ সরবরাহ করত। তারাও বিরোধি শিবিরে যোগদান করল। ফলে ফ্রান্সকে বাধ্য হয়ে তার ঔপনিবেশিক নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে হল। ফ্রান্স আর সামরিক শক্তির দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতেপারছিল না। ১৯৫০ সালে হাবিব বরগিবা (Habib Bourguiba) টিউনিসিয়ার আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করলেন। ১৯৫১ সালে টিউনিসিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করল, আবার সে মন্ত্রীসভা গঠন করার অধিকার পেল। এরপর মরক্কোকেও স্বাধীনতা দেওয়া হল। টিউনিসিয়াও ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে লিবিয়া স্বাধীন হয়ে গেল।

৯.২.৩৫ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

আলজিরিয়াতে স্বাধীনতা আন্দোলন সশস্ত্র আকার ধারণ করেছিল বলে তা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। এই আন্দোলন দীর্ঘায়িত হয়েছিল কারণ এখানে ছিল জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, ফরাসি অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং প্রশাসনিক জটিলতার ত্র্যহস্পর্শ যোগ। আলজিরিয়ার ফরাসি অধিবাসীরা, যাদের অধিকাংশই ছিল সম্পন্ন কৃষক এবং ব্যবসায়ী, অর্থনৈতিক প্রাধান্য ভোগ করত। এই প্রাধান্য আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ফরাসি অধিবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হত তীব্র প্রতিক্রিয়া। যদিও ফরাসিরা ছিল সংখ্যালঘু তবুও তারা নিজেদের কয়েকটি ফ্যাসিস্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, O.A.S. ছিল এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ফ্যাসিবাদী

সংস্থাগুলি আলজিরীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে অস্ত্র প্রয়োগ করত। আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং, ফরাসিদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এছাড়া আলজিরিয়াকে ফ্রান্স তার নিজের সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। তাই এখানে ফ্রান্স দেশীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিল এবং সেখানে নিজ সংবিধান আরোপ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। যুদ্ধকালীন বামপন্থী ফরাসি সরকার আলজিরিয়াকে ফরাসি প্রতিনিধি সভায় (Chamber of Deputies) ১৩ জন প্রতিনিধি পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল। যুদ্ধের পরে ফ্রান্স একটি নতুন সংবিধান রচনা করল, যেখানে বলা হল যে আইন পরিষদে (Legislative Assembly) ফরাসি ও আলজিরিয়ার সম সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আরব সদস্যরা অনেক বেশি সংখ্যক আসন লাভ করেছে। এতে সন্ত্রস্ত হয়ে ফ্রান্স ঐ সংবিধান বাতিল করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন জঙ্গী আকার ধারণ করল। ফ্রান্স নির্মমভাবে আলজিরীয় আরবদের দমন করার কাজে নেমে পড়ল। মিশর, টিউনিসিয়া যাতে আলজিরিয়ার পাশে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তাদের বিরুদ্ধেও সামরিক বলপ্রয়োগ করা হল। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশগুলি আলজিরিয়ার পাশে দাঁড়াল। ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য জোরালো দাবি পেশ করা হল। ১৯৫৮ সালে দ্য গল যখন ক্ষমতায় এলেন তিনি আনুকূল্যের সঙ্গে আলজিরিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বিবেচনা করে গণভোটের কথা ঘোষণা করলেন এবং স্থির করলেন যে আলজিরিয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকারের বিরোধিতা ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও দ্য গল আলিজিরয়া এলেন আভিয়ান সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। এখানে একটি চুক্তির দ্বারা আলজিরিয়ায় ফরাসি সামরিক অত্যাচার বন্ধ হল। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে যে নতুন সংবিধান রচিত হল তদনুসারে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করল।

৯.২.৩৬ নিগ্রো স্বাধীনতা আন্দোলন

দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার কালোদের ওপর ইউরোপীয় দাদারা কর্তৃত্ব করে আসছিল। কিন্তু ঘানা, ব্রিটিশশাসিত উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাজ্যে নিগ্রোরা কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করাতে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবিদ্বেষী নীতি গ্রহণ করেছিল এই ভয়ে যে নিগ্রো চেতনা তাদের অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটেন বুঝতে পেরেছিল যে ঔপনিবেশিকতার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই সে আফ্রিকাতে সামরিক দমন নীতির বদলে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করল। এভাবে ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকাতে একটি বহুজাতিক আইন পরিষদ গঠিত হল। এই একই নীতির ফলে মধ্য আফ্রিকাতে British Central African Unionগড়ে উঠল। কিন্তু ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি ছিল একটু আলাদা। ফ্রান্স চাইত আফ্রিকাবাসীদের ধারাবাহিকভাবে নাগরিক অধিকার দানের মধ্যে দিয়ে তাদের ফরাসি শাসন কাঠামোর মধ্যে একীভুত করে দিতে। যদিও ফ্রান্সের এই নীতি এশিয়া ও মুসলমান অধ্যুষিত আফ্রিকাতে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি কিন্তু নিগ্রো অধ্যুষিত আফ্রিকাতে ফ্রান্স সফল

হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের সময় নিগ্রোরা ফ্রান্সের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমান আফ্রিকানদের মতো নিগ্রোদের কোনো বাইরের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। নিগ্রোদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফরাসি সাম্রাজ্যভুক্ত থেকেও নাগরিক ও রাজনৈতিক সমতা অর্জন। ফরাসি পার্লামেন্টে অনেক নিগ্রো প্রতিনিধি বসত। কাজেই শক্তির বদলে মুক্তিদানেই ফরাসি সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হতে পারত।

৯.২.৩৭ আফ্রিকার ঐক্য আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকান দেশগুলিকে নিয়ে একটি ঐক্য আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক ও শুল্ক ঐক্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে আফ্রিকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলি বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে রাজি ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েষ্ট ইন্ডিজের নিগ্রো জনসাধারণ প্রথম সর্ব আফ্রিকা ঐক্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯১৯ সালের থেকে নিয়মিতভাবে সর্ব আফ্রিকান সম্মেলন আহুত হয়ে আসছে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেষ্টারে একটি সম্মেলন আহুত হয়েছিল, প্রসিদ্ধ নিগ্রো নেতারা নিজেরাই এখানে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্প কিছুদিন পরেই সেখানকার রাষ্ট্রপতি এনক্রুমা (Nkrumah) আক্রাতে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির প্রথম সম্মেলন আহ্বান করলেন। একজন বিদেশি পর্যবেক্ষক মন্তব্য করলেন যে এশিয়া যদিও রাজনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর তবুও সেখানে আফ্রিকার মতো ঐক্যের জন্য এত আগ্রহ নেই। ১৯৬৩সালের মে মাসে ইথিওপিয়ার রাজার আহ্বানে আদ্দিস আবাবাতে যে আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয় তাতে এনক্রুমা প্রস্তাব রাখেন যে শীঘ্রই একটি সর্ব আফ্রিকান সংসদ স্থাপন করা হোক, যাকে বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া উচিত। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (United Arab Republics) রাষ্ট্রপতি নাসের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধী স্বার্থকে মেলানো সম্ভব নয়। তখন ইথিওপিয়ার রাজা প্রস্তাব দিলেন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি একটি সাধারণ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হোক। ঘানা এবং নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা গৃহীত হল। আফ্রিকার ঐক্যের যে সনদ তৈরি হল তাতে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (Organisation of African Unity) প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠিত হবে, সকল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কাউন্সিল অব মিনিস্টারস গঠিত হবে এবং একজন সাধারণ সম্পাদক সহ একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ইথিওপিয়ার রাজার মতে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা এই তমসাময় মহাদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

১৯৪৫ সালে ইউরোপ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, তার শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়িঘর সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছিল নিরন্ন, গৃহহারা এবং উদ্বাস্তু। মনে হয়েছিল ইউরোপের ভাগ্য দুটি অতি-শক্তির (Super Powers) হাতে নিহিত রয়েছে, এই দুটি শক্তি হল আমেরিকা ও রাশিয়া। এই দুটি দেশের সম্মিলিত বিজয়ী বাহিনী ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল এল্‌ব্ নদীর তীরে মিলিত হয়েছিল। ১৯৪৫ সাল পরাজিত জার্মানির জীবনে একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। শীঘ্রই জার্মানি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তৃতীয় রাইখের ধ্বংস ছাড়াও ধ্বংস আরো ব্যাপক ছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি এত ভঙ্গুর যে তা যথেষ্ট

নিরাপত্তা বিধান করতে পারেনা, ফলে জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, উদারনীতিবাদের মতো মৌলিক বিশ্বাস ভেঙ্গে গিয়েছিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

৯.২.৩৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুটি অতি রাষ্ট্রের উত্থান : আমেরিকা ও রাশিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাছাকাছি হয়েছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ফ্যাসীবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে মিত্র জোট ঐক্যবদ্ধ থাকার আবশ্যকতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এই সময় রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের আদর্শগত মতপার্থক্য ভুলে গিয়েছিল। তারা একত্রে যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। আশা করা হয়েছিল যে যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও এই ঐক্যবন্ধন অটুট থাকবে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে গুপ্ত বিরোধ

প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি কখনোই এত আশাব্যঞ্জক ছিল না। শক্তিশালী অক্ষদেশগুলির ভয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা একটি বাহ্যিক মিত্রতার বাতাবরণ বজায় রেখেছিল মাত্র। রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিনের মধ্যে যে আলোচনা হত, যুদ্ধকালীন এইসব সভাতেই এঁদের মধ্যেকার বিরোধ প্রকটিত হয়ে পড়ত। তবুও সাধারণ শত্রুর মোকাবিলায় আপাতত তাঁরা বিরোধসমূহ মুলতুবী রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁরা যে নীতি গ্রহণ করতেন তা ছিল ধোঁয়াটে, ফলে যে কোনো ভাবে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারত। যখন ঐ সব নীতি কার্যকরী করার সময় আসত তখন তা বিতর্ক ও বিরোধের আকার ধারণ করত। বিশেষত যখন আমেরিকা ও রাশিয়া একমত হবার জন্য কোনো সাধারণ শত্রুর অস্তিত্ব নেই, তখন উভয়ের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব ছিল। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের পেছনে রাশিয়ার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রাধান্য ও গুরুত্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, আমেরিকা এগিয়ে না এলে ইউরোপে জার্মানি ও ইটালির বিরুদ্ধে এবং সুদূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে টিকে থাকা মিত্রজোটের পক্ষে সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, আমেরিকা ইউরোপের শক্তিশূন্যতা পূরণ করল। কারণ একদিকে ব্রিটেনের শক্তিহীনতা ও অন্যদিকে হিটলারের অধীন জার্মানির পরাজয় ইউরোপের শক্তিসাম্যের কাঠামোটি তছনছ করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায়, স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া ছিল মহাদেশীয় ইউরোপের একমাত্র সম্ভাব্য নিয়ন্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে আমেরিকা রাশিয়ার প্রাধান্যের দিকে চ্যালেঞ্জ করল। এইভাবে দুই অতিশক্তির পরস্পরবিরোধী অবস্থান আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

অতি শক্তি হিসাবে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিপরীত অবস্থান

দ্বিমেরুকরণ : টয়েনবির মত

সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পরস্পরবিরোধিতার ফলে সমগ্র বিশ্ব দুটি বিপরীত মেরুতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করেন টয়েনবি। এই

ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে পৃথিবী দুটি গোলার্ধে ভাগ হয়ে যায় এবং দুই গোলার্ধের দেশগুলি হয় রাশিয়া নতুবা আমেরিকার উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বেশিরভাগ দেশই ছিল আমেরিকার উপর নির্ভরশীল, অল্প কয়েকটি দেশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন, মোটের ওপর এই দুটি দেশের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়া স্বাধীন অস্তিত্ব আর কারো রইল না।

কিন্তু টয়েনবির এই ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী চীনের এবং স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। চীন ও রাশিয়া উভয়েই কম্যুনিস্ট দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভে উদগ্রীব ছিল। বিশেষত, ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পর রাশিয়া ও চীনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দুই দেশের মধ্যে যেকোনো সময় প্রকাশ্য বিরোধিতা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। চীন ও রাশিয়ার শত্রুতা ঠান্ডা লড়াইয়ে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। অন্যদিকে, রাশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীও অক্ষত ছিল না। যুগোশ্লোভিয়া রাশিয়াকে অগ্রাহ্য করে তার সার্বভৌমত্ব জাহির করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে থাকে এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ এই আন্দোলনে সামিল হয়। আমেরিকা ও রাশিয়া এই তৃতীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তাই পৃথিবীর দ্বিখণ্ডীকরণ কখনোই সম্পূর্ণ ছিল না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরোধ নীতির বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

টয়েনবির মত খণ্ডন

আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরোধের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে যেসব ঘটনা আমেরিকা ও রাশিয়াকে বিপরীতমুখী করে তুলেছিল, তাই এই শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনাকে ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে দেখানো হলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

পোল্যান্ড সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর রাশিয়া অবিলম্বে পূর্ব পোল্যান্ড দখল করে নিয়েছিল। জার্মান আক্রমণে বিধ্বস্ত পোল্যান্ডের উদ্বাস্তুদের নিয়ে লন্ডনে একটি নির্বাসিত পোল সরকার গড়ে উঠেছিল। এই সরকার নিরন্তর সোভিয়েত বিরোধিতা করে গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মস্কো ও তেহেরান সম্মেলনে এই বিরোধ ঘনীভূত হয়েছিল যখন রাশিয়া কোনো মতেই ইউক্রেন ও শ্বেত রাশিয়া পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল না। ১৯৪৪ সালে যখন পোল-সোভিয়েত যুগ্ম বাহিনী পোল্যান্ডে কার্জন রেখা অতিক্রম করল, তখন সেখানে Polish Committee of National Liberation গঠিত হল। এই কমিটি লাবলিনে (Lublin) স্থানান্তরিত হল ও লাবলিন সরকার বলে পরিচিতি পেল। এভাবে পোল্যান্ডের রাজনীতিতে দুটি সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হল—একটি লাবলিন কমিটি, অন্যটি লন্ডনে নির্বাসিত সরকার। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্তালিন সিদ্ধান্তে এলেন যে একটি ব্যাপক সর্বদলীয় জাতীয় সংহতির অস্থায়ী পোল সরকার (Polish Provisional Government of National Unity) গঠন করা হবে। ঐ বছরের জুন মাসে পুরাতন অস্থায়ী সরকারের ষোলো জন সদস্যকে নিয়ে অস্থায়ী সংহতি সরকার গঠিত হল। এই সরকার ছিল প্রকৃতপক্ষে সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত। একটি মোর্চা বা

Democratic Bloc সমাজবাদী, শ্রমিক, কৃষক ও গণতন্ত্রীদের একটি শাখা নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এদের আনুগত্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। ১৯৪৭ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে এই মোর্চা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হল।

পোল্যান্ডের পরিণতির অনিবার্যতা

আসলে পোল্যান্ডকে যে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে হবে তা একরকম অনিবার্য ছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এখানে চার্চিল ও রুজভেল্ট ঐক্যমত হয়ে পোল্যান্ডের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন তা হল এই যে পোল্যান্ডের তদানীন্তন সরকারে গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রসারিত হবে সেই দেশের ভেতরকার ও বাইরের গণতান্ত্রিক নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই সিদ্ধান্ত না নেওয়া ছাড়া পশ্চিমী শক্তিদ্বয়ের (আমেরিকা ও ব্রিটেন) কোনো উপায় ছিল না। কারণ তাঁরা শাঁখের করাতের মধ্যে পড়েছিলেন, ইয়াল্টায় যদি পোল্যান্ড সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত না হত তাহলে সোভিয়েত সহায়তায় লাবলিন সরকার পোল্যান্ডে ক্ষমতা দখল করত।

পোল্যান্ডের ঘটনা—শঠে শঠ্যং সমাচরেৎ

পোল্যান্ডে রাশিয়ার আচরণ থেকে মনে হতে পারে যে রাশিয়া তার নিরাপত্তার বিষয়টিকে এতই প্রাধান্য দিয়েছিল যে সে যেকোনো প্রকারে পোল্যান্ডকে তার প্রভাবাধীনে রাখতে চেয়েছিল। আসলে, পশ্চিমী দেশগুলিও সুযোগমতো এই একই নীতি অনুসরণ করেছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় পশ্চিমও তার নিজস্ব প্রভাবাধীন এলাকা তৈরি করেছিল।

নাৎসী অধিকারমুক্ত ও শত্রু দেশগুলিতে মার্কিনী নীতি

পশ্চিমী শক্তিবর্গের মুক্তপন্থী নীতি যে নিছক বাগাড়ম্বরের বেশি কিছু নয়, এটা বোঝা গেল যখন উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকা ও ব্রিটেন জ্যাঁ দালাঁর আত্মসমর্পণের শর্ত মেনে নিল। দালাঁ ছিলেন ফরাসি বাহিনীর নাৎসি সহযোগী। তিনি আত্মসমর্পণের শর্ত হিসাবে উত্তর আফ্রিকায় রাজনৈতিক আধিপত্য আদায় করেছিলেন।

ইতালি

দক্ষিণপন্থী সামরিক নেতা বাদোলিও ছিলেন পাশবিক ইথিওপিও অভিযানের নায়ক। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে ও মুসোলিনির প্রশাসনিক কাঠামো অটুট রেখে দিয়েছিল। কাজেই বোঝা গিয়েছিল যে আদর্শ নয় প্রভাব বজায় রাখাই আসল কথা আর এজন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে কোনো ব্যক্তিকে কাজে লাগাবে।

গ্রিস

ব্রিটিশ বাহিনী যখন এথেন্সে প্রবেশ করে, তখন ব্রিটিশ সরকারের ব্যবস্থাপনায় গ্রিসে নাৎসি সহযোগী ও রাজতন্ত্রীদের একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটেন যখন বামপন্থীদের

নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে তখন সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন করে বামপন্থীদের ওপর নির্মম অত্যাচার করেছিল। ব্রিটিশ পাশবিকতায় ব্রিটেনে হাউস অব কমন্সে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও রুজভেল্ট চার্চিলকে সমর্থন করেছিলেন। স্তালিনও সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, কারণ, ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে স্তালিন, চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল যে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত প্রভাবাধীন থাকবে আর গ্রিস থাকবে ব্রিটিশ প্রভাবে। এই সমঝোতা মেনে নিয়ে স্তালিন গ্রিক কম্যুনিস্টদের কোনো সমর্থন জানাননি বরঞ্চ তাদের নিরুৎসাহ করেছিলেন।

জার্মানি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা গ্রহণ করে। রাশিয়া চেয়েছিল জার্মানিতে একটি কেন্দ্রীভূত সরকার গড়ে জার্মানির সম্পদ ব্যবহার করে সোভিয়েত অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে। অন্যদিকে আমেরিকা চেয়েছিল জার্মানিতে একটি গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা স্থাপিত হোক। ১৯৪৬ সালে রাশিয়া অধিকৃত জার্মানি থেকে কম্যুনিস্ট ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু হল এবং সোস্যালিস্ট দল ও কম্যুনিস্ট দল একত্রিত হয়ে তৈরি হল সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি (Socialist Unity Party)। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব বার্নেস (Byrnes) ঘোষণা করলেন যে পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিন অধিকৃত জার্মান ভূখণ্ডে অভিন্ন অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতি অনুসরণ করা হবে। এইভাবে ১৯৪৭ সালের পয়লা জানুয়ারি ইঙ্গ মার্কিন অধিকৃত অঞ্চল দুটি একীভূত হল এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফ্রান্স অধিকৃত অঞ্চলও এর সাথে যুক্ত হল। সংযুক্ত অঞ্চলে নতুন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হল, মুদ্রামান স্থিতিশীল হল এবং শিল্পোৎপাদন শতকরা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেল। এরপর সেখানে নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হল।

জার্মানি বিষয়ে সোভিয়েত অসন্তোষ

পশ্চিম জার্মানির পাশ্চাত্য অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা স্বভাবতই রাশিয়ার মনঃপুত ছিল না। রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে আসে। পশ্চিমাঞ্চলের স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে বেহাল অবস্থায় পড়বে এই রকম আশঙ্কা দেখা দিল।

বার্লিন অবরোধ

এই অবস্থায় রাশিয়া বার্লিন শহর অবরোধের সিদ্ধান্ত নিল। কারণ, বার্লিন শহরটি ছিল পশ্চিম অধিকৃত এবং তা ছিল সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানির কেন্দ্রস্থলে। তাই রাশিয়া পশ্চিম শক্তির সঙ্গে বার্লিন শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। ১৯৪৮ সালের ২৪ শে জুলাই বার্লিন অবরোধ শুরু হল। এর ফলে রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব বার্লিন অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিনে কোনো সরবরাহ পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। পশ্চিম বার্লিনের জনজীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠল। ১৯৪৯ সালের ১২ই মে অবরোধ তুলে নেওয়া পর্যন্ত আকাশ পথে সরবরাহ অব্যাহত রইল।

বার্লিন অবরোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

যদিও বার্লিন অবরোধের সোভিয়েত নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তবুও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত মার্কিন সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেছিল। এরপরেই মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসি অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম জার্মানি রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটল। এর নাম হল জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক। শুধু তাই নয়, আমেরিকার নেতৃত্বে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organisation বা NATO) গঠিত হল পশ্চিম ইউরোপের যৌথ নিরাপত্তা বলবৎ করার জন্য। ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানিও NATO-র অন্তর্ভুক্ত হল। অন্যদিকে, পূর্ব জার্মানিও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল, যাকে স্বীকৃতি দিল সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু জার্মানির ঘটনাবলি স্তালিনের ব্যর্থতা প্রমাণিত করেছিল। কারণ, স্তালিন ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে খণ্ডিত জার্মানি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তবুও হাল না ছেড়ে ১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ স্তালিন পশ্চিমের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। যার মধ্যে ছিল একটি চতুঃশক্তি সম্মেলন আহ্বান, জার্মানির ঐক্যকরণ, জার্মানি থেকে বিদেশি সেনা অপসারণ প্রভৃতি শর্ত। স্তালিন জার্মানির নিরপেক্ষতা ও তার নিজস্ব সেনা গঠনের বিষয়েও সম্মতি দিলেন। কিন্তু পশ্চিম এই সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। ফলে জার্মান সমস্যার কোনো সমাধান হল না, বরঞ্চ, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠল, কারণ, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নিয়ে রাশিয়া NATO-র প্রত্যুত্তরে গঠন করল ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw PACT), যেখানে পূর্ব জার্মানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী ও রাশিয়ার বিভাজন সম্পূর্ণ হল।

রাশিয়া ও পশ্চিমের সংঘর্ষ : প্রতিদ্বন্দ্বী চুক্তি সংগঠন প্রতিষ্ঠা

জার্মানিকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর বিরোধের তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ পরিণাম ছিল আমেরিকার নেতৃত্বে NATO গঠন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার উদ্যোগে সম্পাদিত হল ওয়ারশ চুক্তি। এইভাবে আরো আঞ্চলিক চুক্তিজোট বিশ্বের রাজনীতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলল। মার্কিন সোভিয়েত বিরোধ আরো ঘনীভূত হল। ঠান্ডা লড়াইয়ের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারী করে তুলল।

NATO

১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, আইসল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস্ NATO গঠন করল। এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা, নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহায়তা গড়ে তোলা, বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একক বা সমবেতভাবে অস্ত্র ধারণ এবং নিরাপত্তা পরিষদ যতক্ষণ না পর্যন্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। নামে উত্তর আটলান্টিক হলেও এই চুক্তি সংগঠনে ইতালি, গ্রিস এবং তুরস্কের মতো দেশ ছিল। এদের কাজ ছিল ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণে বাধা দেওয়া। এইভাবে NATO সোভিয়েত বিরোধী চরিত্র ধারণ করল যা তার ঘোষিত উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকে নিছক মিথ্যায় পরিণত করেছিল।

ওয়ারশ চুক্তি

NATO-র প্রত্যুত্তর হল ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত হওয়া ওয়ারশ চুক্তি। এটি ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি নিয়ে গঠিত একটি পাল্টা চুক্তি সংগঠন। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ছিল রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া এবং পূর্ব জার্মানি। মস্কো ছিল এই সংগঠনের কর্মকেন্দ্র। এই চুক্তির দোহাই দিয়ে রাশিয়া ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ দমন করেছিল।

SEATO

কম্যুনিস্ট ভীতি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল South East Asian Treaty Organisation (SEATO)। কম্যুনিস্ট চীনের অভ্যুদয় সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কম্যুনিস্ট আদর্শ ও নীতির সম্প্রসারণের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। এই আশঙ্কাকে মূলধন করে আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবির গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিল। SEATO ছিল একটি প্রতিরক্ষা পদ্ধতি, যাতে সামিল হয়েছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্‌স্। দেখা যাচ্ছে যে এখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপস্থিতি ছিল নগণ্য। এর অঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রধান, তা হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও সন্নিহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কম্যুনিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই সংগঠনের নিজস্ব সামরিক বাহিনী না থাকায় আমেরিকার সামরিক শক্তির উপর তা নির্ভরশীল ছিল। ফলে আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নাক গলানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

ANZUN PACT 1951

কোরীয় যুদ্ধে কম্যুনিস্টদের সাফল্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আমেরিকা ১৯৫১ সালে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সাথে এই চুক্তি গড়ে তুলেছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কম্যুনিজ্‌ম্ সম্প্রসারণ রোধ করার জন্য। যে কোনো একটি দেশ বিদেশি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনটি দেশ একত্রে লড়বে আর তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ এই চুক্তিটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

বাগদাদ চুক্তি অথবা CENTO

তৈলসম্পদে সমৃদ্ধি ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মধ্যপ্রাচ্য অনিবার্যভাবে পাশ্চাত্য ও সোভিয়েত বিরোধিতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আরব দেশসমূহ নিয়ে গঠিত আরব লীগ এই দ্বন্দ্বকে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে না দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ইহুদিদের প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমর্থন আরব দেশগুলিকে রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিল। ফলে আমেরিকা আর দূরে থাকতে পারল না। তেল, ইহুদি ও রুশভীতি এই তিনটি রন্ধ্র দিয়ে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে পা রেখেছিল। ১৯৫৫ সালে ব্রিটেনের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত হল বাগদাদ চুক্তি, যাতে যোগ দিয়েছিল ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও পারস্য এবং অবশ্যই ব্রিটেন। কিন্তু প্রত্যাশামতো মিশর, সিরিয়া ও সৌদি আরব এই চুক্তিতে যোগদান করল না, তারা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করল। উপরন্তু মিশরে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইহুদি আক্রমণের ব্যর্থতা মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের প্রভাব হ্রাস করল। রাশিয়া এই সুযোগের সুবিধা নিতে বিলম্ব করল না। তখন আমেরিকা প্রথমে আর্থিক ও পরে সামরিক সাহায্যের সম্ভার নিয়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার

করতে সক্ষম হল। কিন্তু মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন আমেরিকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হল। তবুও বাগদাদ চুক্তি ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তা কোনো সামরিক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। সোভিয়েত প্রভাবও তা দূর করতে পারেনি, উপরন্তু আরব দেশগুলি পাশ্চাত্য বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল।

নিরস্ত্রীকরণের আবডালে অস্ত্র প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন আমেরিকা ছিল একমাত্র দেশ যার হাতে ছিল পারমাণবিক বোমার শক্তি। আমেরিকা মনে করেছিল যে এর ফলে রাশিয়া তার শর্ত মেনে নেবে। কিন্তু রাশিয়া তাতে ভয় না পেয়ে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে বসল। কাজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নিরস্ত্রীকরণের জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। পারমাণবিক বোমা অস্ত্রের বিকাশের এক নিরতিশয় সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করল। বিভিন্ন জাতীয় সরকার তাদের উদ্যোগ ও অর্থ ব্যয় করতে লাগল আরো শক্তিশালী অস্ত্র বানানোর কাজে, যার ফলে ১৯৫২ সালে আমেরিকা বানালো হাইড্রোজেন বোমা, ১৯৫৩ সালে রাশিয়াও এই সাফল্য অর্জন করল। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে যথাক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে ফেলল।

ঠান্ডা যুদ্ধ ও অস্ত্র বৃদ্ধি

এমতাবস্থায় যখন ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে উঠল, তখন নিরস্ত্রীকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হল। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ও সাধারণ সভায় (General Assembly) সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ অস্ত্রসংখ্যা প্রকাশিত করে একটি আন্তর্জাতিক সহমত গড়ে তোলার প্রস্তাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া পাল্টা প্রস্তাব দিল যে আগে অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো হোক, তারপর তথ্য প্রকাশ করা হবে ও একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গড়ে তোলা হবে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও রাশিয়ার চাপান উতোর

১৯৫২ সালে যে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠন করা হল তার সদস্য হিসাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রস্তাব দিল যে আণবিক অস্ত্রের পরিমাণ ধাপে ধাপে কমানো হোক, আমেরিকা ও রাশিয়া কোনো দেশকে বিপন্ন না করে। কিন্তু রাশিয়া এই প্রস্তাব এক কথায় খারিজ করে দিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে যখন রাশিয়া পাল্টা প্রস্তাব দিল, এবং এই প্রস্তাব ইঙ্গ-ফরাসি প্রস্তাবের প্রায় কাছাকাছি ছিল, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইউরোপের বিশেষত জার্মানির নিরাপত্তার বিষয়টি আগে বিবেচনা করার কথা তুলল।

নিরস্ত্রীকরণ অসম্ভব

ক্রমশ বোঝা গেল যে জাতীয় পর্যায়ে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ একান্ত অসম্ভব। বিশেষ করে আমেরিকা এই প্রশ্ন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিল, কারণ ইতিমধ্যেই জার্মানির পুনরস্ত্রীকরণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় জেনিভা সম্মেলনে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যতই প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নগুলির মীমাংসা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণের কোনো সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব জার্মানিতে সোভিয়েত

আধিপত্য এই ধরণের কোনো সমাধানকে বাস্তবায়িত হতে দিল না। উপরন্তু রাশিয়া তখন দ্রুতগতিতে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করার আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ১৯৫৭-র আগস্ট মাসে যখন পশ্চিমী শক্তিবর্গ আংশিক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব দিল তখন রাশিয়া এককথায় তা প্রত্যাখ্যান করল। তবে ১৯৫৮ সাল থেকে পরমাণু বোমা পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শুরু হল। এ বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য জেনিভায় আবার একটি সম্মেলন বসল। রাশিয়া ঘোষণা করল যে সে পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবে, তারপরেই সে বেশ অনেকগুলি পরমাণু পরীক্ষা চালাল। ব্রিটেনও রাশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ১৯৬০ সালে ক্যাম্প ডেভিডে আইজেনহাওয়ার ও ক্রুশ্চেভ ভুগর্ভে পরমাণু পরীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করলেন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া একটি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও চীনে পরমাণু বোমা তৈরি করতে সফল হয়ে গিয়েছিল। এই দুটি দেশ কোনোভাবেই এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি ছিল না।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিহানি পূর্ব ইউরোপে এক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়ার লালফৌজ পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে জার্মানিকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণ মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবার স্তালিন রাশিয়ার নিরাপত্তার পুনরুজ্জীবনের জন্য পূর্ব ইউরোপের সম্পদ প্রয়োজন ছিল। আবার পূর্ব ইউরোপ রাশিয়ার শিল্প পণ্যের সম্ভাব্য বাজার ছিল। জার্মান কবল থেকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে মুক্ত করে রাশিয়া সেখানে সমধর্মীয় রাজনৈতিক কাঠামো স্থাপন করতে চেয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে একটি অনুগত প্রভাবাধীন বলয় রাশিয়ার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাবে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে।

সোভিয়েতকরণের গতিধারা

পূর্ব ইউরোপে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলিতে সোভিয়েতকরণ কেন ও কিভাবে সম্ভব হল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পিটার কালভোকোরেসি তাঁর World Politics Since 1945 গ্রন্থে বলেছেন যে রুজভেল্ট ও চার্চিল ইয়াল্টা সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতি যে নমণীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলে সে পূর্ব ইউরোপে বিনা বাধায় অগ্রসর হয়েছিল, তবে যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তব পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াকে সক্রিয় বাধাদান সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সেটন ওয়াটসন তাঁর (East European Revolution গ্রন্থে বলেছেন যে রাশিয়া সুপরিকল্পিত উপায়ে পূর্ব ইউরোপকে গ্রাস করেছিল। এর জন্য রাশিয়া একটি ত্রিস্তর পরিকল্পনা করেছিল—প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট গোষ্ঠী নিয়ে যৌথ প্রশাসন, দ্বিতীয় স্তরে অ-কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে বিদায় করে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কমিউনিস্টদের স্থাপন ও তৃতীয় স্তরে সর্বাত্মক একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আবার ডেভিড হরোউইজ এই ব্যাখ্যা মানেননি। তাঁর From Yalta to Vietnam গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যদি ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির আগমন না ঘটত এবং পাশ্চাত্য দেশগুলি

তীব্র বিদ্বেষ পরিত্যাগ করত তবে রাশিয়া অনমণীয় হত না এবং পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করত।

পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েতকরণের ফলে পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে সংঘাতের সূচনা

১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরির সোভিয়েতকরণ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে কমিউনিজ্‌ম্ প্রসার রোধ করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যদানের ব্যাপক কর্মসূচি অর্থাৎ মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষণা করে মার্কিন সরকার। ঐ বছরই চেকোশ্লোভাকিয়া মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। তখন স্তালিনের নির্দেশে চেক প্রধানমন্ত্রী গটওয়াল্ড সমস্ত বিরোধী দলকে উৎখাত করে কমিউনিস্ট দলের শাসন কায়েম করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা পাশ্চাত্য মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সম্পর্কের অবনতি ঘটল। এই পরিস্থিতিতে, যুগোশ্লাভিয়ার স্বাতন্ত্র্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী সচেতনতার স্ফুরণ লক্ষ্য করা গেল। সেখানে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে জার্মান প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। তাই জার্মানির কবল মুক্ত হতে যুগোশ্লাভিয়া রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল না। মার্শাল পরিকল্পনা ঘোষণার পর টিটো বলকান অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। টিটো গ্রিসের কমিউনিস্ট সংগ্রামীদেরও সাহায্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। স্বভাবতই স্তালিন ক্রুদ্ধ হলেন। পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে যে কমিনফর্ম গঠন করা হল, সেখান থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হল। তার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কিন্তু টিটো তাতে দমলেন না। তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতায় বহাল রইলেন এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

ছদ্মবেশী সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ

যুগোশ্লাভিয়া ও ফিনল্যান্ড ছাড়া পূর্ব ইউরোপের সর্বত্র সাম্যবাদী কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু স্তালিন পুরোপুরি গ্রাস করার নীতি থেকে বিরত রইলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য গোষ্ঠী ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে পূর্ব ইউরোপ থাকুক। ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ দখল করার সঙ্গতি রাশিয়ার ছিল না, আর তাতে পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারত। অন্যদিকে মার্শাল পরিকল্পনাকে প্রতিহত করার জন্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক সংহতি বিধানের জন্য ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) গঠিত হল। দ্রুত শিল্পায়নের নীতি ও যৌথ খামার ব্যবস্থা গ্রহণ করে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ধাঁচের অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা হল। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি যাতে সামরিক বিষয়ে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল হয় সেজন্য Military Co-ordination Committee গঠিত হল, সোভিয়েত প্রতিরক্ষা বাহিনীর মার্শাল বুলগানিন হলেন এর চেয়ারম্যান। একটি যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হল তাতে অনুগামী রাষ্ট্রগুলিকে ১.৫ মিলিয়ন সৈন্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। এভাবে পূর্ব ইউরোপে স্তালিন এক ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করলেন।

মধ্যপ্রাচ্য সংকট : ইজরায়েলের অভ্যুত্থান

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটেছিল, অন্যদিকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর ক্রমিক আগমনের ফলে আরব-ইহুদি পৌনঃপুনিক সংঘর্ষের অবতারণা হয়েছিল। ইহুদি জাতিগোষ্ঠীর

নিজ বাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি আর আরব জাতীয়তাবাদের মুক্তিলাভের উদগ্র বাসনা এই দুই পরস্পরবিরোধী বিষয়কে একবিন্দুতে মেলাতে গিয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনকে প্রচণ্ডভাবে দোটানায় পড়তে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়। এরপর জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইনের ম্যান্ডেট ছেড়ে দেয়। এরপর জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে প্যালেস্টাইন দ্বিধাবিভক্ত হয়—একটি ইহুদি জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র এবং অপরটি আরবজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ইহুদিরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব নিয়ে গঠিত আরব লীগ নতুন ইজরায়েল রাষ্ট্রকে যৌথভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু আরব সঙ্ঘ ক্ষুদ্র ইজরায়েল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইজরায়েল একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এশিয়াতে ঠান্ডা লড়াইয়ের অনুপ্রবেশ : কোরিয়ার যুদ্ধ

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই কোরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। ৩৮° সমান্তরাল রেখার উত্তরে রাশিয়ার ও দক্ষিণে আমেরিকার সৈন্য অবস্থান করছিল। জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়া দুই অতি শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট সিংম্যান রীর নেতৃত্বে একটি মার্কিন অনুগত সরকার দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে আমেরিকা আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিতে থাকে। এইভাবে কোরিয়া উপদ্বীপে এক উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের পরামর্শদাতা জন ফস্টার ডালেস দক্ষিণ কোরিয়ার আইন সভায় ভাষণে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৯৫০ সালের ১৯ জুন ডালেস এই প্রতিশ্রুতি দিলে উত্তর কোরিয়ার সোভিয়েত অনুগামী সরকার ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে কোরিয়া যুদ্ধের সূচনা হল। দক্ষিণ কোরিয়া জাতিপুঞ্জে সাহায্যের আবেদন জানাল। যদিও যুগোশ্লাভিয়া, ভারত ও মিশর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল, তবুও সিংহভাগ মার্কিন সহায়তায় গঠিত মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী জাতিপুঞ্জের তরফে কোরিয়ায় গেল, তবুও উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার ৯৫ ভাগ দখল করে নিল। আসলে আমেরিকা কোরিয়ার সাম্যবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ম্যাক আর্থারকে কোরিয়ায় স্থিতিশীলতা আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হল। এই সূত্র ধরে ম্যাক আর্থার ৩৮° রেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়াকে পদানত করলেন। এরপর ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করতে চাইলেন। তখন চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী চীনে প্রবেশ করে ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল দখল করে। ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে যখন প্রচণ্ড রকম প্রতিশোধের কথা ভাবছেন, তখন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁকে বরখাস্ত করলেন। কারণ আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে একটি দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। এ বিষয়ে আমেরিকার মিত্র রাষ্ট্রগুলিও চাপ সৃষ্টি করেছিল। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতি এশিয়া ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়েছিল এবং ইউরোপ কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটেছিল। চীনে সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং চীনের সাথে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা আমেরিকাকে বিচলিত করে তুলেছিল। আমেরিকা সামগ্রিকভাবে সাম্যবাদ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফিলিপাইন্স্, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ANZUS

চুক্তি জোট গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ এবং পশ্চিম জার্মানিতে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন অসাফল্যের পরোক্ষ ফল।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির উন্মেষ ঘটে এবং সমগ্র বিশ্ব দুটি পরস্পর বিবদমান শক্তি শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দ্বিমেরুকরণ বিশ্বরাজনীতিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এছাড়া বিশ্ব রাজনীতিতে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটি বিকল্প তৃতীয় কূটনৈতিক বলয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঠান্ডা লড়াইয়ের ফলে উদ্ভূত সংঘাত পূর্ণ পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল, কারণ পাকিস্তান পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে চেয়েছিল। ফলে ভারতের পক্ষে একটি বিকল্প শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। এইভাবে জোট নিরপেক্ষতা নীতির উদ্ভব হল।

জোট নিরপেক্ষতার প্রকৃতি

জোট নিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে ভারত আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে। বিপন্ন স্বাধীনতা, আক্রান্ত ন্যায়নীতি ও আগ্রাসন সমন্বিত এই বিশ্বে নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। তৃতীয় বিশ্বের তথা এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে বিবদমান দুই শক্তিশিবির থেকে তাদের মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে প্রথমে দিল্লি ও পরে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং এ নির্জোট সম্মেলন হয়। ১৯৬১ সালের জুন মাসে হয় কায়রো সম্মেলন এবং সেপ্টেম্বর মাসে হয় বেলগ্রেড সম্মেলন। এই সম্মেলনগুলি নির্জোট আন্দোলনকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এর ফলে সদ্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা লাভ করেছিল। এর ফলে ঠান্ডা লড়াই কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। আমেরিকার জঙ্গী হস্তক্ষেপনীতি ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে বাধা পেয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়াও তার ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদী নীতি থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। আমেরিকা ক্রমশ সংঘাত নীতি থেকে সমঝোতা নীতির দিকে সরে এসেছিল।

তৃতীয় বিশ্বের উত্থান ও তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তৃতীয় বিশ্বের ধারণা বিকশিত হয়েছিল। এই ধারণার বহুমুখিতা বিভিন্ন লেখকের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। আলজিরিয়ার লেখক ফ্রানজ ফ্যানন (Franz Fanon) মনে করেন যে তৃতীয় বিশ্ব হল সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের অন্তর্বর্তী স্তরে অবস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের ভৌগোলিক বলয়। হরোউইজ বলেন যে তৃতীয় বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য তার অর্থনীতিতে। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি এই দুইয়ের কোনোটি গ্রহণ না করে তৃতীয় বিশ্ব তার নিজ অর্থনৈতিক বিকাশের পথ

বেছে নিয়েছে, তবে প্রয়োজন বুঝে দু ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণকারী দেশের থেকেই সাহায্য চেয়েছে। মাও সে তুং মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত দুই শক্তি কেন্দ্রকে অনুসরণ না করে এশিয়া ও আফ্রিকার শোষিত জাতিসমূহ তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন, এই দেশগুলি ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অধীন ছিল বলে এরা স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দেশগুলি অনুন্নত এবং জীবনযাত্রার মান অনেক নিম্নমুখি। কোনো শক্তিজোটের মধ্যে না থেকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী বলে এরা প্রায় সকলেই নির্জোট আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। তবে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। যেমন, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা—এই তিনটি মহাদেশ জুড়ে এদের অবস্থিতি এদের ভৌগোলিক পার্থক্য রচনা করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের মাত্রা এক নয়। ভিয়েতনাম, কিউবা, ইয়েমেন, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার সমর্থক, আবার ভারত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। অধিকাংশ দেশগুলির আর্থিক কাঠামো হল পুঁজিবাদী। আবার ইরাক, ইরান, ভারত ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়নশীল অথবা উন্নত। অধিকাংশ দেশই হল অনগ্রসর। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভারতসহ ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ যেমন জোট নিরপেক্ষ, তেমন পাকিস্তান, ইরান, জর্ডন, তুরস্ক, সৌদি আরব ও থাইল্যান্ড মার্কিন জোটের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় জাপান পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর সমকক্ষ এবং জাপানও আমেরিকার সঙ্গে জোটবদ্ধ। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি বিকল্প কূটনৈতিকব্যবস্থা গ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্ব ঠান্ডা লড়াইয়ে দীর্ণ পৃথিবীতে সংঘাতহীন পরিবেশ আনার চেষ্টা করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, আরব-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব, ইন্দোচীন সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যায় তৃতীয় বিশ্ব ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটেছে ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ সংযত হয়েছে। তাই, বিশ্বশান্তির পক্ষে তৃতীয় বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৯.২.৩৯ আমেরিকার উত্থান

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এম. কীন্‌স চোদ্দো দফা নীতির প্রবর্তক মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তাঁর কোনো পরিকল্পনা, কোনো কর্মসূচি, কোনো গঠনমূলক ধারণা নেই, আছে খালি বাগাড়ম্বর, আর তার বলেই তিনি সারা বিশ্বে এমন মর্যাদা ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন যে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর ঐ কথা আর বলা যেত না। আমেরিকার বিশাল অর্থনৈতিক এবং শিল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৫০% বহন করত, এই শক্তির সঙ্গে মানানসই ছিল তার সামরিক শক্তি। পক্ষান্তরে, একই প্রজন্মের মধ্যে দুবার ইউরোপ বিশ্বকে যুদ্ধে জড়িত করেছিল। সুতরাং, রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত ইউরোপের ওপর আমেরিকা তার মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন চাপিয়ে দেবার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে চারিদিকে যখন পরাজয়ের অবসন্নতা তখন আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল অবিসংবাদিত। এমতাবস্থায় পশ্চিম ইউরোপের পুনর্গঠন যে আমেরিকার পথ ধরে

হবে তা নতুন কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনেনি। বিংশ শতকের গোড়ার থেকেই আমেরিকার শিল্পোৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতি ইউরোপীয় সমাজগুলিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। জর্জেস ডুহামেল (Georges Duhamel) ১৯৩০-এর দশকে লিখেছিলেন America The Menace। রবার্ট অ্যারন (Robert Aron) এবং অ্যারামন্ড ড্যানডিয়ার (Aramond Dandier) লিখেছিলেন The American Cancer। দুটি বই-ই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমেরিকা যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি চালু করেছিল তাতে গণভোগ্য পণ্যগুলির ব্যাপক ও একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে উৎপাদন হত, শুধু তাই নয়, এই পণ্যগুলির জন্য নতুন বিপণন পদ্ধতি ও নতুন গণসংযোগ পদ্ধতিও চালু হয়েছিল। এই নতুন পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছিল ফোর্ডবাদ (Fordism)। কারণ বিখ্যাত এই মোটর গাড়ি নির্মাতা শুধু জনসাধারণের জন্যই উৎপাদন করেননি, ও শুধুই উৎপাদন বৃদ্ধি করেননি, উচ্চহারে বেতন দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া শ্রমিক শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। দুটি যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে বলা হত যে আমেরিকার এই পদ্ধতি আমেরিকার জন্য উপযুক্ত, কারণ সেখানে যন্ত্রায়ণের প্রসার ঘটানোর মতো পুঁজি আছে, জিনিসের মান ধরে রাখার মতো প্রসারিত আভ্যন্তরীণ বাজার আছে এবং আছে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শ্রমিক। ১৯৩৯ সালের আগে সত্যি সত্যি ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এর কোনোটি মানানসই ছিল না। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পরে আমেরিকার অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি কাজে না লাগিয়ে ইউরোপের পুনর্গঠন ও শিল্প বিকাশ সম্ভবপর ছিল না।

শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের পথ ধরে এসেছিল সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার। আমেরিকার অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি তাকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চালকের আসন দিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের ধারণার সাথে সাথে আমেরিকার নৈতিক ও জাগতিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাও ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। একথা সত্য যে ১৯৪৫ সালের পর থেকে আমেরিকা সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে ইউরোপের পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইউরোপের পুনর্গঠন মানেই যে মার্কিণীকরণ—বিষয়টি এত সরল নয়। একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকা সবচেয়ে উন্নত শিল্পায়িত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে গেলে হয় তাকে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হত নতুবা ঐ মডেল অনুসরণ করতে হতো। ইউরোপ দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকান সৈন্য তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো ইউরোপে আমদানি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে আমেরিকা তার নিজস্ব মডেল অনুযায়ী জার্মানিকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ পেয়েছিল। প্রথমে এই মডেল চালু করা হয়েছিল আমেরিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন দক্ষিণ জার্মানিতে, তারপরে তা মিত্রপক্ষের দখলীকৃত অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং Federal Republic of Germany জন্ম লাভ করে। এই খণ্ডিত জার্মানির মডেলটি পরে, বিশেষত ঠান্ডা লড়াই শুরু হবার পরে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ গ্রহণ করেছিল।

৯.২.৪০ সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অসাধারণ সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল, তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জার্মানির পক্ষে ৮০% প্রাণহানি ঘটেছিল তার পূর্ব সীমান্তে। যুদ্ধের পরেও ইউরোপের মধ্যস্থলে রাশিয়ার উপস্থিতি অব্যাহত ছিল। নতুন উত্থিত কম্যুনিস্ট দেশগুলিকে ক্রমাগত সমর্থন করে সে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে চলছিল। এসবের দ্বারা রাশিয়া আমেরিকার সমকক্ষ এক অতিশক্তি হিসাবে পরিগণিতও হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল যে রাশিয়ার শক্তি সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই অতিরঞ্জিত হয়েছিল। যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকার অর্থনৈতিক